মৃতের আত্মহত্যা

আবুল ফজল

সোহেলী কি স্বপ্ন দেখছে ?

সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হয় তার কাছে। যদিও সে দাঁড়িয়ে আছে স্বল্পপরিসর এক জানালার কাছে, তার দুই আয়ত চক্ষু তাকিয়ে আছে দিগন্তের পানে। শুধু তাকিয়েই আছে, দেখছে না কিছুই। ধূ-ধূ বালি ছাড়া কীই বা আছে দেখার এখানে—না একটা গাছপালা, না সবুজের কোনো নিশানা!

জানালায় মুখ রেখে নিঃশ্বাস নিতে গেলেই নাকে ঢোকে তপ্ত হাওয়া। সে সঙ্গে কিছু তপ্ততর বালিও। এরই নাম কি মরুভূমি ? কেন সে এখানে ? এ প্রশ্ন তাকে অহরহ ক্ষতবিক্ষত করে। ভেতরের এক আবছা অন্ধকার কক্ষে কম্বলের এক শক্ত বিছানায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে বকুল, তার তিন বছরের শিশু। তার প্রথম সন্তান। ফুলের মধ্যে বকুল তার সব চাইতে প্রিয়, কিশোরী বয়স থেকে, যখন থেকে খোঁপা বাঁধতে শুরু করেছে, তখন থেকে খোঁপায় এক-আধটা বকুল গুঁজে দেওয়া তার প্রায় অভ্যাসে পরিণত। স্কুলে যেতে, স্কুল পেরিয়ে কলেজে যেতেও সে তা-ই করত।

স্বামী চেয়েছিল গালভরা জবরজং একটা নাম দিতে—সিকান্দার কি আলমগীর এমনি। দিগ্‌বিজয়ীদের কারও নামে নাম। সালাহুদ্দীন বাবর—এ নামের জন্যে খুব পীড়াপীড়ি করেছে। সোহেলী রাজি হয় নি—আমার ছেলে ফুলের মতো ফুটে উঠবে, চারদিকে ছড়াবে খোশবু এ আমার আরজু। বলতে বলতে ওর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল, মাতৃত্বের পুলকে ও গর্বে।

: বকুল নামটা বড্ড মেয়েলি, মেয়ে হলে মানাত।—স্বামীর মন্তব্য।

: না, আমি ওকে বকুল বলেই ডাকব। পরে আরও তো আসবে, সেগুলোর নাম তুমি তোমার পছন্দমতো রেখো। এখানেই তো শেষ নয়।

মুখটা তার লাল হয়ে উঠল, লজ্জায় ঘাড় ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

সেই থেকে ওর নাম বকুল হয়ে গেছে। বকুল ঘুমুচ্ছে অঘোরে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার সুকোমল বুক, পেট ওঠানামা করছে। সোহেলী জানালা থেকে ফিরে এসে ঘুমন্ত শিশুর পুষ্পকোমল মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। ছেলে হলেও ও যেন মায়ের মুখেরই আদল পেয়েছে। কোথায় যেন ওর ছোটভাই খোকনের সঙ্গেও খানিকটা মিল রয়েছে। ঘুমন্ত ছেলের একটা হাত তুলে নিয়ে আলতোভাবে তাতে চুমো খেল সোহেলী।

ভেতরের অস্থিরতা কিছুটা যেন শান্ত হয়ে এল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছেলের মুখের দিকে, যে মুখ দেখে তার কখনো তৃপ্তির শেষ হয় না।

এখানে আসার পর যে ভাবনা তাকে প্রতিমুহূর্তে অস্থির করে তোলে, সে ভাবনাটাই ফের ফিরে এল, বড় হলে বকুল কি সেপাই হবে ? ক্ষুদে হাতটার দিকে চেয়ে মনে মনে বলে, এ হাত কি বন্দুক ধরবে, মানুষ মারবে ? সোহেলীর ভেতরটা কেঁপে ওঠে, ডুকরে ওঠে—না, না, না। চোখ বেয়ে অঝোরে পানি ঝরতে থাকে সোহেলীর। শিশুর হাতটা তুলে নিয়ে তাতে আর একবার চুমো খেল, তারপর একটা পাতলা চাদর বকুলের গায়ের ওপর বিছিয়ে দিল।

দরজায় একটা শব্দ যেন হলো। আঁতকে উঠল সোহেলী। সামান্য শব্দেও আজকাল আঁতকে ওঠে, এক অজানা আশঙ্কায় ভেতরটা ওঠে কেঁপে। দরজায় ধাক্কা পড়ল কয়েকবার। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলল রগড়ে রগড়ে। মাপা পানি দিয়ে কাজ চালাতে হয় এখানে। পানির দেশের মেয়ে সে। ওদের দেশের বাড়িতে ভেতরে-বাইরে পুকুর, বিয়ের আগে সাঁতার কেটে গোসল না করলে ওর তো গোসলই হতো না। ছোট ভাবি তো কোনোদিনই পারে নি সাঁতারে ওকে হারাতে। এমনকি খোকনকেও কত দিন হারিয়ে দিয়েছে সে। খোকনের পৌরুষে লাগল তো, বারবার চ্যালেঞ্জ করে বসাতে, ছোট বু আর একবার...। সোহেলীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ছায়াঘেরা শান্ত শীতল তাদের অন্দরবাড়ির পুকুর, তার চারপাড়ের গাছপালা, ঘাট—যে ঘাটের সবচেয়ে নিচের ধাপে বসে শুভ্র পা দুখানি ডুবিয়ে সে আঁচলের মাথায় সাবান লাগিয়ে গা ডলত।

এ তার এক সুখ-স্বপ্ন, যে স্বপ্নে বাধা পেয়ে সে একটু বিরক্ত হলো বৈকি। তবুও যেতে হলো দরজার দিকে। দরজা খুলতেই ঢুকল আফরোজা, তার স্বামীর সহকর্মী মেজর রকিবের স্ত্রী। সে-ও বাংলাদেশের মেয়ে, তবে সোহেলীর মতো অত ভেঙে পড়ে নি। এ মরুদেশে একরকম করে সে মানিয়ে নিয়েছে। সবই আল্লার মর্জি—এতে সান্ত্বনা খোঁজে, হয়তো সান্ত্বনা পায়ও আফরোজা, এ বাক্য সময়ে-অসময়ে উচ্চারণ করে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আফরোজা বলে উঠল, সোহেলী, তুমি আজও কাঁদছিলে ? কেন কেঁদে কেঁদে জীবনটা শেষ করে দিচ্ছ ভাই ? ডানহাত ওপরের দিকে তুলে বলল, সবই ওপরওয়ালার মর্জি। তা নাহলে আমরা কেন আজ এখানে।

: আফরোজা আপা, কান্না ছাড়া আমার জীবনের আর কী আছে, আমি তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ একা থাকি, কান্নার সুযোগ পাই, তখনই শুধু মনে হয় বেঁচে আছি। তারপর মনে হয় আমি যেন মরা। দেহটা নড়াচড়া করে বটে কিন্তু আমি তো মৃত। আপা, মরা মানুষ কি খাওয়াদাওয়া করে। আমি যা হোক কিছু না কিছু পেটে দিচ্ছি। এর মানে কি বেঁচে থাকা ?

মুহূর্তে আনমনা হয়ে যায় সোহেলী।

: আমার এত সব আবেগ-অনুভূতি কোথায় গেল আজ ? তুমি তো জানো না আপা, কলেজে থাকতে আমি কবিতাও লিখতাম। একটা খাতা প্রায় ভরে উঠেছিল। বিয়ের পর

বকুল তখন পেটে এসেছে। নতুন অনুভূতি আমাকে যেন আবার নতুন করে নাড়া দিল, মনে মনে গুনগুন করে উঠল কবিতার দু-একটা কলি। খাতাটা বের করে চাইলাম কিছু লিখতে, নতুন মাতৃত্বের একটা অনুভূতি চাইল ভাষা পেতে। অজানা আনন্দের এক ফল্গুস্রোত, অপূর্ব এক পুলক, যা অনির্বচনীয়, অথচ প্রতিমুহূর্তে শিরায় শিরায় আলোড়িত। কবিতায় ছাড়া যা প্রকাশ করা যায় না। হঠাৎ মচমচ করে তিনি এসে ঢুকলেন। সৈনিকের বুটের মর্ম বুঝতে পারো ? মুহূর্তে কবিতার অপমৃত্যু। তাঁর হাতে এলএমজি আর আমার হাতে তখনো কলম। আমার দুই কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে সে কঠোর কণ্ঠে বলল, কী হচ্ছে ? প্রেমপত্র লেখা হচ্ছে বুঝি ? আমার হাতের কলম পড়ে গেল। সামলাতে পারলাম না, বললাম, বিয়ের পর প্রেম থাকে নাকি শুনি ? না নতুন করে আসে ? সন্তান পেটে মেয়েরা প্রেম করে না। তোমার মনে এতই যখন সন্দেহ, বিয়ে করতে গেলে কেন ? আমার মা-বাবা সেধে তো বিয়ে দেন নি।

আমার কণ্ঠস্বর হয়তো ঝাঁজালো হয়ে উঠেছিল সেদিন। কথাগুলোও হয়ে উঠেছিল ধারালো। ভেতরের উত্তেজনা সামলাতে না পেরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে আমি দাঁড়িয়ে ওর চোখের ওপর চোখ রাখলাম। চোখ দুটো আমার হয়তো লাল হয়ে উঠেছিল, হয়তো উঠেছিল জ্বলে।

: কী, এত বড় সাহস ? বলে হাতের এলএমজিটা সজোরে দোলাল একবার। তারপর টেবিলের ওপর থেকে খাতাটা তুলে নিয়ে ফাৎ ফাৎ করে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। আমার কবিতার মৃত্যু ঘটল। এভাবে সেই থেকে সীতা আমার চিরনির্বাসিতা। আপা, সেদিন থেকে আর কোনোদিন খাতা-কলম নিয়ে বসি না। অলক্ষে মনে মনে কী যে এক বেদনা আমি বয়ে বেড়াচ্ছি তা আর কেউ বুঝবে না। তারপর এসব ঘটনা।

একটু সময়ের জন্যে কেমন আনমনা হয়ে যায় সোহেলী। তারপর বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে বলে, আফরোজা আপা, এ কি সৈনিক-জীবনের লক্ষ্য ? এরই নাম কি বীরত্ব ? কেন আমাদের আজ এ দশা ? কেন আজ আমরা এখানে ? ধু-ধু মরুভূমির সঙ্গে আমাদের কী-ই-বা সম্পর্ক ?

সোহেলী ফের আনমনা হয়ে পড়ল বুঝি। স্বগতই যেন বলতে লাগল, সাঁতার কেটে গোসল করতাম প্রতিদিন। সেসব কে কেড়ে নিল আমার জীবন থেকে ?

আফরোজার চোখের সামনেও কি ভেসে উঠল বাংলাদেশ, কিশোরগঞ্জের এক অখ্যাত পাড়াগাঁ, মাথা-পেরিয়ে ওঠা ঘন পাটের সবুজ-খেলা ? সবুজের অপরূপ নয়নজুড়ানো সমারোহ দেখতে দেখতে ছুটিশেষে ভরা নদীপথে নৌকায় চড়ে শহরের হোস্টেলের পথে পাড়ি জমানো। ছায়াছবির মতো এরকম কত ছবি তার মনে ভেসে ওঠে। আফরোজাকেও কি স্বপ্নে পেয়ে বসল ? সে-ও হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে সোহেলীকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই বলে চলল, সোহেলী, বোন, কে কেড়ে নিলে আমাদের জগৎ, আমাদের জীবনের সবুজ শ্যামলিমা, আমাদের নদ-নদী, পালতোলা নৌকা, খেয়া পারাপারের আনন্দমুখর সকাল-সাঁঝ ? আর কি ফিরে পাব সে

দুনিয়া ? কেন হলাম না এক গরিব স্কুল-মাস্টারের বউ ? তাহলে তো প্রতিদিন শুনতে পেতাম বাংলা ভাষার কলকণ্ঠ, দেখতে পেতাম চিরচেনা সবুজের মেলা। সোহেলী, যখন পাড়ার স্কুলে পড়তাম, বাড়ি থেকে আল বেয়ে স্কুলে যাওয়া-আসার সময় পাটগাছ আর সবুজ পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে পথ চলা আমার এক অভ্যাস ছিল। শুঁকে দেখলে এখনো যেন আমি আমার হাতে পাটের গন্ধ পাই। কত দিন কচি পাটপাতার শাক খাই নি! জিভে যেন এখনো লেগে আছে!

স্বপ্ন দেখতে দেখতে আফরোজাও যেন আনমনা হয়ে যায়।

দুজনের বুকে বুক লাগিয়ে কান্না যেন কিছুতেই থামতে চায় না। উভয়ের সশব্দ ফোঁপানিতে বকুলের ঘুম গেল ভেঙে। ডেকে উঠল 'মা' বলে।

আফরোজার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সোহেলী আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ছুটে এল বকুলের কাছে। অশ্রুভেজা মুখে হেসে ওকে তুলে নিয়ে বলল, দুধ খাবে ?

বকুল কিছুটা হতভম্ব। বলল, না।

: কেন, খিদে পায় নি ? এখন তো তোমার দুধ খাওয়ার সময় বাবা।

বকুল ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইল মা আর আফরোজা খালার দিকে।

আফরোজার নিজেকেও স্বাভাবিক করার প্রয়োজন রয়েছে। বলল, এখন যাই, ওবেলা নাহয় আর একবার আসব।

য়ূনুস, মেজর য়ূনুস, সে নাকি কোনো-এক যুদ্ধে খুব বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তাই সুজাতে হিম্মত বা ওই ধরনের কী একটা উপাধি বা পদকও সে পেয়েছে, তার ইউনিফর্মে ওই পদকচিহ্ন আঁকা। য়ূনুস সারা দিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, নাহয় ঘরে বসে ভাবতে থাকে। কাজকর্ম নেই, যে সরকারকে তারা গদিতে বসিয়েছে, সে সরকারই তাদের মাসোয়ারা দেয়, তাতেই চলে খাওয়া-পরা।

মুশকিল হয় সোহেলীর। স্বামী যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষণ সে যেন মরা, মুহূর্তে নিষ্প্রাণ এক মৃতদেহ। স্বামীর কথার উত্তরে হ্যাঁ, না বা এক শব্দে যেটুকু উত্তর দেওয়া সম্ভব সেটুকুই শুধু দেয়। য়ূনুস বিরক্ত হয়ে কোনো কোনো দিন বলে, এমন বেজার হয়ে থাকলে চলে কী করে ? তোমার মুখে এখানে আসার পর একবারও হাসি দেখলাম না। কেন, কী হয়েছে ? দেশে থাকতে বন্ধুরা ঈর্ষা করে বলত তোমার মুখের হাসি নাকি তুলনাহীন। একবার হাসো না লক্ষ্মী, তোমার হাসিমুখ দেখি নি কত দিন।

দীর্ঘদিন এ মিনতির সুর য়ূনুসের কণ্ঠে শোনা যায় নি।

: তুমি ভালো করেই জানো আমার মুখের হাসি শুধু নয়, আমার সারা দেহের হাসি আজ নিহত। আর সে হাসি কে চিরদিনের জন্য হত্যা করেছে তা তোমার অজানা নয়। আমাকে আর যা-ই বলো হাসতে বোলো না।

: কেন ? কেন ? কে আবার তোমার হাসিকে হত্যা করল ? বলো কে সে ?

য়ূনুস এক কোণে রাখা এলএমজি'র দিকে একবার ফিরে তাকাল।

: বলতে হবে কেন ? তুমি ভালো করেই জানো। তোমার কি মন বলে কিছু নেই ? নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো না—উত্তর সেখানেই লুকিয়ে আছে। সে উত্তরকে বেশি দিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না। যাবেও না।

ইঙ্গিতটা য়ূনুসের না-বুঝতে পারার কথা নয়।

: দেখো দেশ, রাষ্ট্র, জাতি অনেক বড়। তোমরা মেয়েরা হয়তো এসব কথা বুঝবে না, তার জন্য বহু রক্তপাত করতে হয়, মহৎ উদ্দেশ্যে এ রক্তপাত প্রয়োজন, প্রয়োজন ছিল, হয়তো আরও প্রয়োজন হবে।

: আরও! বলো কী! দেশমাতার রক্তপিপাসা এখনো মেটে নি ? দশ বছরের বাচ্চার রক্ত পান করেও ?

আনমনা হয়ে যায় সোহেলী। মুহূর্তকাল পর আবার বলে, দেখো আমি মা হয়েছি, প্রাণের মূল্য আমি বুঝি, আমাদের দেহ বিদীর্ণ করেই শিশুর জন্ম হয়, সে শিশুই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে মানুষ।

সোহেলী যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, কেটে যায় আনমনা ভাব।

: য়ূনুস, তুমি কাটখোট্টা সেপাই, তবু মানুষ তো। একদিন বর সেজে আমাদের বাড়ি এসেছিলে, অন্তত সেদিন তো মানুষ ছিলে। সেদিন যখন আমার আব্বা-আম্মা আমার মেহেদিরাঙা হাত দুখানা তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তখন তোমার কেমন লেগেছিল বলতে পারব না, কিন্তু আমার সারা শরীর এক অনির্বচনীয় আনন্দে, আবেশে, পুলকে, ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। আমার চোখে পুলকাশ্রু আর সারা মুখে আনন্দের রক্তিমাভা দেখে আম্মা কী খুশিই না হয়েছিলেন!

: সোহেলী, তোমার মতো কবিত্ব করে আমি হয়তো বলতে পারব না, তোমার মেহেদিরাঙা হাত দুখানা নিয়ে আমারও আনন্দের সীমা ছিল না। আম্মা-আব্বা আর সবাই যদি চারদিকে ঘিরে না থাকত চুমোয় চুমোয় আমি তোমার হাত দুখানা ভরে দিতাম সেদিন।

: য়ূনুস সাহেব, এসবের কি কোনো তুলনা আছে ?

: তুমি আজ হঠাৎ আমাকে সাহেব বলছ যে ?

: সবাই তো বলে তুমি আমার সাহেব। চাকরবাকরেরা তো বলেই। এমনকি বান্ধবীরাও মাঝে মাঝে বলে থাকে তুমি আমার সাহেব। সাহেব মানে তো মালিক, তুমি আমার দেহটার মালিক তো বটেই! বকুল না থাকলে এ দেহ বহন করার যন্ত্রণা থেকে আমি রেহাই পেতে চাইতাম। তোমার এলএমজি'র সামনে বুক পেতে দিয়ে বলতাম, তোমার কলেমা পড়ে পাওয়া দেহটার সবটাই তুমি নাও। আমার প্রাণ উঠে যাক আমার শ্যামল মায়ের কোমল বুকে, আমাদের ছায়াঢাকা পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটে, যেখানে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে হাঁসের ডুবসাঁতার দেখতাম, শুনতাম কোকিলের ডাক। কত দিন পাশের বাড়ির সখিনা চুপিচুপি এসে পেছন থেকে দুহাতে আমার চোখ দুটো ধরত।

বলতাম, সখি, ছাড়... হাত ছেড়ে ও খিলখিল করে হেসে বলত, তুমি ধ্যান করলে কী হবে, মেজর সাহেব হয়তো বন্দুক সাফ করতেই মশগুল। তখন তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা চলছিল মাত্র।

সোহেলীর বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

: আমার প্রাণটা আমার সেই ফেলে আসা ভূস্বর্গে ফিরে যাওয়ার জন্যে অহরহ নীরবে কাঁদছে, তুমি কি তা বুঝতে পারো না ?

: তুমি বুঝতে পারছ না আমরা দেশের কত বড় উপকার করেছি। একদিনেই চালের দাম আট টাকা থেকে চার টাকায় নেমে এসেছে, জানো ?

: চালের দাম কমাবার কি আর কোনো উপায় ছিল না ? সোহেলীর ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। তার জন্য বালক আর নববধূর রক্তের দরকার ছিল বুঝি ? বাংলাদেশ রক্তঝরা লকলকে জিবওয়ালি ক্ষুধিতা কালী হয়ে উঠেছিল বুঝি সেদিন ? দুখানা, না চারখানা মেহেদিরাঙা হাত কি তোমাদের পথে তেমন কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারত ? সেই ভয়াবহ রাতে তারা কি তাদের নবীন স্বামীদের বুকে নিশ্চিত নির্ভাবনায় মাথা রেখে ঘুমায় নি মেহেদিরাঙা হাত দুখানা নিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ?

: এসব চিন্তা করে তুমি কেন খামাখা মন খারাপ করছ ?

সজোরে সিগারেটে একটা টান দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মেজর য়ূনুস বিরক্তির সঙ্গে বলল।

: আমি মানুষ, আমার মন আছে বলেই আমার মন খারাপ হয়।

: তোমরা মেয়েরা বুঝতে পারবে না দেশ কত বড়।

: দেশ, জাতি, রাষ্ট্র অনেক বড় মানি; কিন্তু প্রাণ, মানুষের প্রাণ এসবের চেয়ে অনেক বড়, প্রাণের মূল্য অনেক বেশি, অনেক ওপরে। ইসলামই তো বলেছে যে, মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা। দেশ, জাতি, রাষ্ট্র এ সবই তো মানুষের বানানো জিনিস।

থেমে একটু কী যেন চিন্তা করে বলল, আচ্ছা, বকুলের গালে কেউ যদি অকারণে একটা চড় মারে তুমি কি তা সহ্য করবে ? বকুলেরও তো একদিন দশ বছর বয়স হবে। তোমার কোনো বন্ধু বা অধস্তনদের কারও মাথায় যদি ঢোকে তোমাকে এবং সে সঙ্গে আমাকে আর বকুলকেও হত্যা করা হলে দেশ বিপদমুক্ত হবে, দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, চালের দাম দুটাকায় নেমে আসবে তখন কী দশা হবে, তুমি দেশের খাতিরে এ যুক্তি মেনে নেবে ?

য়ূনুস চুপ।

সোহেলী বলল, আমি বীরাঙ্গনা হতে চাই না, চাই না বকুলকেও বীর কিংবা সিপাই বানাতে। কথার জের ধরেই বলে চলে সোহেলী, আচ্ছা তুমি যেখানে ইচ্ছা থাকো বা যাও আমাদের আপত্তি নেই, আমাকে আর বকুলকে কি কোনো প্রকারে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারো না ? তোমার পায়ে পড়ে বলছি এটুকু অনুগ্রহ আমাদের করো।

সত্য সত্যই এই প্রথমবারের মতো সোহেলী য়ূনুসের পা দুখানি জড়িয়ে ধরল।

য়ূনুস ওকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর দুই গালে আর ঠোঁটে অজস্র চুমো খেল। কিন্তু সোহেলীর দেহ অসাড়, যেন প্রাণহীন এক কাষ্ঠপুত্তলিকা, তাতে না-আছে কোনো সাড়া, না-আছে এতটুকুন উত্তাপ কী উত্তেজনা, কী এতটুখানি আবেগের ছোঁয়া। এ যেন এক মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরে মৃতের মুখে চুমো খাওয়া।

য়ূনুসের বাহু আলগা হলে সোহেলী আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাথরুমে ঢুকে রগড়ে রগড়ে মুখ-হাত-ঠোঁট ধুয়ে নিল। ফিরে এসে বলল, হলো তো, এখন পাঠিয়ে দেবে তো আমাদের ?

: দেখি।

উদাস ও নিরুত্তাপ গলায় একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে য়ূনুস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাছাকাছি কয়েকটা বাড়িতে তার সহকর্মীরা থাকে, ওখানে গিয়ে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাবে।

বিকেলে আবার আফরোজা এল।

সোহেলী নিজেই মনে করে সে এখন মৃত। লজ্জা-শরমের কোনো অনুভূতিই যেন আর নেই তার মনে। তাই আফরোজাকে সব খুলে বলল, ও আজ আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব চুমো খেয়েছে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। জানো, একদিন চুমো নিয়েও আমি কবিতা লিখেছিলাম। এমনকি রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন। প্রিয়জনের চুম্বনের সেই অনির্বচনীয় পুলক, সর্বদেহে যা একদিন রোমাঞ্চের সৃষ্টি করত, তা আজ কোথায় হারিয়ে গেল। কী এক অসম্ভব পরিবর্তন, এখন ওর স্পর্শে আমার সারা শরীর রি রি করে ওঠে। বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে নেওয়ার পর মনে হলো আমি আবার পাক-সাফ হলাম।

আফরোজা বলল, আমাকে যখন ও ধরতে আসে আমি বলে ফেলি, দেখি তোমার হাতটা। ও বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দেখো। মনে হয় তার হাতে এখনো রক্ত লেগে আছে। শুঁকলেই যেন রক্তের গন্ধ পাই। হয়তো আমার মনের ভুল। এতদিন তো রক্তের গন্ধ থাকার কথা নয়।

সামলে নিয়ে আফরোজা আবার বলল, কিন্তু উপায় নেই বোন, আমরা মেয়ে হয়ে জন্মেছি। ঘৃণায় মন রি রি করে উঠলেও ওর হাতে ধরা দিতে হয়। দেশে হলে কবেই আমি পালিয়ে যেতাম, নয়তো গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে ডুবে মরতাম। এ পোড়া দেশে একটা পুকুরও যদি থাকত! এমন জীবন নিয়ে কদিন বাঁচা যায় ?

সোহেলী বলে, অদৃষ্ট আমাদের প্রতি এমন বে-রহম হওয়ার কোনো মানে হয় ? বিয়ের আগে মা-বাবা তো একবেলাও নামাজ বাদ দিতে দেন নি আমাকে। তার কি এ নতিজা ?

উদাস কণ্ঠেই সে বলে চলে, খুনির বউ, বকুল খুনির সন্তান। এ পরিচয় কী করে আমি বহন করব ? বড় হলে সেও বা কী করে বইবে এ বোঝা ? আফরোজা আপা, আত্মহত্যা করে আমি এ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে চাই।

: আত্মহত্যা আরও বড় গুনাহ, ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ।

: এ দুই গুনাহর মাঝখানে আমরা কি চিরকাল নিষ্পেষিত হতে থাকব ? তা হয় না আপা।

: না, না সোহেলী, এমন কাজটি কোরো না বোন।

একটু থেমে, বিষণ্ন কণ্ঠে, আবার বলে আফরোজা, এখন যাই, গিয়ে আবার রান্না চড়াতে হবে। রুটি বেলতে হবে। এখানে সবই তো নিজেকে করতে হচ্ছে।

রাতেই অবস্থা সবচেয়ে অসহ্য হয়। য়ূনুসের স্পর্শে সোহেলীর সর্বশরীর কুঁকড়ে যায়। কোনো সাড়াই যেন থাকে না দেহে। তবুও মরার মতো পড়ে থেকে সয়ে যেতে হয় সব অত্যাচার।

: আগের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরো না কেন ? য়ূনুস উষ্মার সঙ্গে বলে।

সোহেলী কোনো উত্তর দেয় না। অস্থির য়ূনুস নিজেই ওর হাত দুখানা টেনে নিয়ে ওর পিঠের ওপর রাখে, নিঃসাড় হাত দুখানা ঢলে পড়ে যায় দুপাশে, যেন মরা মানুষের হাত। সোহেলীর শরীরে এতটুকু সাড়া জাগে না। বাধা দেওয়ার উপায় নেই, এ দূর দেশে সে যেন এক অসহায় বন্দি।

কোনো কোনো দিন সোহেলী বকুলকে মাঝখানে শুইয়ে দিয়ে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু য়ূনুসের যখন ঝোঁক চাপে তখন তুলে সে তার ওপাশে শুইয়ে দেয়। ঘুমন্ত শিশু কিছুই বুঝতে পারে না।

সোহেলীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা দেহমনের সাড়ার কোনো তোয়াক্কা নেই ওর, চড়াও হয়ে পড়ে, অসাড় সোহেলী কলাগাছের মতো শীতল দেহে পড়ে থাকে, তার ওপর চলে বীরের অত্যাচার।

এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় বছর দুই কেটে যায়।

একদিন সোহেলী মুখে হাসি টেনে এনে বলল, বকুলকে তো এখন কোনো নার্সারি বা শিশুদের স্কুলে দেওয়া দরকার। তাই ওকে দেশে পাঠাবার প্রয়োজন। এখানে এভাবে থেকে গেলে ও একটা আকাট মূর্খই থেকে যাবে।

: সে তো অনেক খরচের মামলা।

: বড়ভাই তো রিয়াদে চাকরি নিয়ে এসেছেন। ওঁকে বললে খরচ আর পাঠাবার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। আব্বা নাকি এবার হজে আসছেন, তাঁর সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

: তখন আমাদের জীবনটা তো একদম ফাঁকা হয়ে যাবে।

: কেন, আর একটা যে আসছে। তখন ওকে নিয়েই তো আমাকে বিব্রত থাকতে হবে সব সময়।

প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি আপন নিয়মে করে যায়। সেখানে ইচ্ছা-অনিচ্ছার বালাই নেই।

সোহেলী যেদিন টের পেয়েছে সেদিন থেকে তার নিজের প্রতি ঘৃণা আরও বেড়ে গেছে। বকুল যখন এসেছিল তখন য়ূনুস অন্য মানুষ, খুনের দাগ লাগে নি তার হাতে। এখন সে একটা খুনির সন্তানকে কী করে পেটে ধরবে, কী করে বহন করবে, কী করে করবে প্রসব ? এখন থেকে প্রতিমুহূর্তে তার কাছে অসহ্য, দুর্বহ হয়ে উঠেছে জীবন। দেশে ফেরার সুযোগ এলেও সে দেশে ফিরবে কোন মুখে ? আঙুল উঁচিয়ে কেউ যদি বলে—খুনির বউ, খুনির ছেলের মা!

বকুলকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা সহজেই হয়ে গেল। সোহেলীর বড়ভাই আদিল হজের কয়েকদিন আগে এসে বকুলকে নিয়ে গেল। সেখান থেকে হজ শেষে নানার সঙ্গে বকুল দেশে ফিরবে।

হজ শেষে মোশারফ সাহেব নাতিকে নিয়ে দেশে ফিরে এলেন।

ছেলের নিরাপদে দেশে ফেরার খবর পাওয়ার পর, সোহেলী মনে মনে যা ভাবছিল, সেটাই এখন সংকল্প হয়ে দেখা দিল—দোজখে যেতে হলেও ওকে তা করতেই হবে। এখন যে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে তার প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে তার চেয়ে দোজখ-যন্ত্রণা কি বেশি অসহনীয় হবে ?

ডাকে বাবার নামে একখানা চিঠি লিখল সোহেলী। সংক্ষেপে তাতে অনুরোধ জানাল—

> বাবা-মা, সোহেলী নামে আপনাদের একটি মেয়ে ছিল সে কথা ভুলে যান। বকুলকে মানুষ করবেন, লেখাপড়ায় ভালো ফল করলে সে যেন অধ্যাপক হয়, অন্তত শিক্ষক, অথবা সাধারণ অন্য যে-কোনো চাকরি, হোক তা কেরানির। সে যেন তার বাবার পেশা গ্রহণ না করে। তার জন্যে এ আমার শেষ অছিয়ত।

সে সঙ্গে য়ূনুসকেও একখানা চিঠি লিখল,

> য়ূনুস, মেজর য়ূনুস, তুমি আমার সাহেব, আমার দেহের তুমি মালিক। এ দেহকে তুমি আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে ব্যবহার করেছ, ভদ্রতার খাতিরে ব্যবহার কথাটা প্রয়োগ করলাম, আসলে নির্যাতন কথাটাই ঠিক প্রয়োগ হতো। বাঞ্ছিত পুরুষের সঙ্গে যখন মিলন ঘটে তখন নারীর সর্বদেহ কথা বলে ওঠে, গত দুবছর ধরে তুমি

আমার বোবা দেহের ওপরই চালিয়েছ নির্যাতন। আজ আমার সে দেহটা সম্পূর্ণভাবে তোমাকে দিয়ে গেলাম। এ দেহ আর কোনোদিন কথা বলবে না। যে হাসিকে তোমার বন্ধুরা অতুলনীয় বলে ঈর্ষা করত, সে হাসি আর কোনোদিন আমার মুখে ফুটবে না। হ্যাঁ, প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত রমণী-মুখের হাসিকে একমাত্র ফুল ফোটার সঙ্গেই দেওয়া যায় তুলনা। একদিন যে হাসি আমি হাসতে পারতাম আর তা ছিল আমার এক পরম সম্পদ, আমার সে হাসিকে তুমি চিরকালের জন্যে নিভিয়ে দিয়েছ। তা আর ফুটবে না, জ্বলবে না কোনোদিন। এখানে এ দূর বিদেশ-বিভুঁইয়ে বিষ, বিষের আরবি কী তাও আমি জানি না, সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। তাই অত্যন্ত অশ্লীলভাবে আমার প্রাণটা নিজের হাতে শেষ করে দেহটা তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম। বকুল আমার মা-বাবার কাছে মানুষ হবে, এ আমার শেষ বাসনা। যদি পারো আমার এ শেষ আরজিটা রক্ষা কোরো।

বকুলকে নিয়ে বাবার নিরাপদে দেশে পৌঁছার খবর পাওয়ার সপ্তাহখানেক পর একদিন ঘুম থেকে উঠে য়ূনুস সোহেলীকে কোথাও দেখতে না পেয়ে, ডেকেও কোনো সাড়া না পেয়ে, এ-ঘর ও-ঘর বাথরুম ইত্যাদি ঘুরে, রান্নাঘরের পাশের ফালতু কুঠুরিটায় হঠাৎ দেখতে পেল ছাদের বিমের সঙ্গে সোহেলীর দেহটা ঝুলছে, গলায় গিঁট দিয়ে জড়ানো তার বিয়ের বেনারসি শাড়ির আঁচল।